বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তি : বাংলাদেশের সুযোগ ও সম্ভাবনা

মো: শহীদুল হাসান*

১। ভূমিকা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ অর্থনীতিতে তত বেশি সমৃদ্ধশালী হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন, খনিজ সম্পদ আহরণ, পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমুদ্রের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বের ভূ-কেন্দ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন উপকূলীয় দেশসমূহের জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গোপসাগরের জলরাশি এবং এর তলদেশের নানাবিধ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে।

সমুদ্রসীমানা আইন (UNCLOS-III) অনুযায়ী একটি দেশের সমুদ্রসীমার ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আঞ্চলিক সমুদ্র ও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপরে উক্ত দেশের অধিকার থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে এড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মায়ানমার সমদূরত্বের ভিত্তিতে রেখা টেনে সমুদ্রসীমার অধিকাংশ অংশ নিজেদের বলে দাবী করে (রশিদ ২০০৮)। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ন্যায্যতার (ইক্যুইটি) ভিত্তিতে রেখা টানার পক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় রেখা অবতল আকৃতির হওয়ায় বাংলাদেশ ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নির্ধারণে যুক্তি উপস্থাপন করে। বাংলাদেশ সরকার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভারত এবং মায়ানমারের সাথে অনেক বার চেষ্টা করেও আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে (ITLOS) ০৮ অক্টোবর ২০০৯ সালে দুইটি মামলা দায়ের করে (Datta 2014)। দুইটি মামলাই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০১২ ও ২০১৪ সালে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই সম্ভাবনা সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ থেকে শুরু করে খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য আহরণ, যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, পর্যটন, সমুদ্র নিরাপত্তা সহ সমুদ্রকে ঘিরে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রকে ঘিরে পরিপূরক এই অর্থনৈতিক মডেল 'ব্লু ইকোনোমি' বা 'নীল সমুদ্র অর্থনীতি' বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনতে পারে বিশাল সম্ভাবনা। দারিদ্র্য বিমোচন ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মুক্তিতে সমুদ্র বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে পটভূমি প্রদানের পর দ্বিতীয় অংশে "সমুদ্রসীমানার বিভাজন" ও "নীল সমুদ্র অর্থনীতির" ধারণার সম্যক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমুদ্রসীমানা নিয়ে বিরোধের কারণ ও নিষ্পত্তি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে বাংলাদেশ সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সমুদ্র সম্পদ

* বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন লে: কর্ণেল।

আহরণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ এবং করণীয় প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে আলোচনা পূর্বক ষষ্ঠ অংশে উপসংহার টানা হয়েছে।

২। সমুদ্রসীমানার বিভাজন এবং নীল সমুদ্র অর্থনীতি ধারণার সম্যক বিশ্লেষণ

স্বাধীনতার পর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশই প্রথম দেশ হিসেবে পার্লামেন্টে "The Tetrtitorial Waters and Maritime Zones Act" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাশ করে (Chowdhury 2008)। উক্ত আইনে বঙ্গোপসারে ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এর বাহিরে মহিসোপান অঞ্চল দাবী করা হয়। তখন থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমার এর সাথে সীমানা নির্ধারণে আলোচনা শুরু হয়। বর্তমান জাতিসংঘ কর্তৃক যে সমুদ্র আইন (United Nation Convention for Law of the Sea) প্রণীত হয়েছে তা ১৯৫৮ সালে UNCLOS-I হিসেবে প্রথম গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে UNCLOS-II হিসেবে দ্বিতীয় বার এবং চূড়ান্তভাবে ১৯৮২ সাল থেকে UNCLOS-III (1982) হিসেবে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (UN 1987)।

১৯৮২ সালে সমুদ্র আইন নিয়ে যে চুক্তিটি হয়েছিল তাতে রয়েছে ৩২০টি ধারা, ১৭টি অধ্যায় ও ৯টি সংযোজন (Spalding 2007)। জাতিসংঘের সমুদ্র সীমানার এই আন্তর্জাতিক আইন (UNCLOS) অনুসারে একটি দেশের সমুদ্রসীমা আঞ্চলিক সমুদ্র (১২ নটিক্যাল), সন্নিহিত অঞ্চল (২৪ নটিক্যাল), একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (২০০ নটিক্যাল) এবং এর বাহিরে মহিসোপানের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত (Houghton 2010)। মহিসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপরে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। সমুদ্র চুক্তির ৭৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী উপকূলীয় দেশসমূহে মহিসোপানের অধিকার ২০০ মাইলেরও অধিক প্রায় ৩৫০ নৌমাইল পর্যন্ত ভোগ করতে পারবে। তবে এই অতিরিক্ত ১৫০ মাইলের অধিকার পেতে হলে ২১ সদস্যের জাতিসংঘ মহিসোপান কমিশনের কাছে তথ্য ও উপাত্তসহ দাবি জানাতে হবে। তারই প্রেক্ষিতে মিয়ানমার ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮, ভারত ১১ এপ্রিল ২০০৯ এবং বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে তাদের নিজ নিজ দাবী ঐ কমিশনের কাছে জমা দেয়।

চিত্র ১-এ সমুদ্র আইন অনুযায়ী সমুদ্রসীমানা বিভাজন প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র, ২৪ নটিক্যাল মাইল সন্নিহিত অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল।

চিত্র-১: সমুদ্র আইন অনুযায়ী সমুদ্র সীমানা বিভাজন।

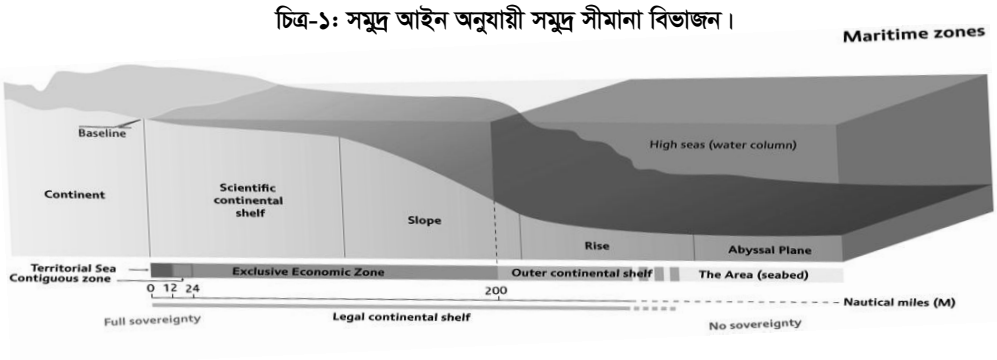

২.১। নীল সমুদ্র অঞ্চল

জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০-২২ জুন ২০১২ ব্রাজিল এর রিও ডি জেনেরিও শহরে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নীল সমুদ্র অর্থনীতিকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পন্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয় (নাথ ২০১৪)। উপকূলীয় ও দ্বীপসমৃদ্ধ দেশগুলোর পক্ষ থেকেও সমুদ্রকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করে গণমানুষের কল্যাণ সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন সম্ভব বলে দাবি করা হয়। সমুদ্র ও সাগর হচ্ছে নীল অর্থনীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাদের অভিমত হচ্ছে, সমুদ্রের বিশাল সম্পদকে আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং তার মাধ্যমে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা সহজ। এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৌশলগত সহযোগিতার প্রয়োজন হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত।

নীল অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হচ্ছে, সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীর ৭২ ভাগ দখল করে আছে এবং জীবমণ্ডলের ৯৫ শতাংশের উৎস হচ্ছে সাগর ও মহাসাগর (Bhuiyan and Alam 2014)। এছাড়া পৃথিবীর ৮০ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে।[১] পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের খাদ্যভাণ্ডার যোগান দিতে পারে নীল সমুদ্র এবং নীল অর্থনীতি হতে পারে বিশ্ববাসীর অন্যতম আশ্রয়। বিশ্বব্যাপী এ নতুন ভাবনাকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে, যদিও এক্ষেত্রে বিরাজ করছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। নীল অর্থনীতি যেসব সম্পদের সন্ধান দেবে তার মধ্যে আছে তেল ও গ্যাসসহ অন্যান্য খনিজ, মৎস্য, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজভাঙা শিল্প, সমুদ্র পরিবহন ও পর্যটন, লবণ আহরণসহ আরও অনেক সম্ভাব্য ক্ষেত্র। তাই নীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রথমে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়ে বাংলাদেশের।

৩। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমুদ্রসীমানা নিয়ে বিরোধের কারণ ও নিষ্পত্তি

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আলোচনা শুরু করে। তবে এতে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। এরপর ২০০৯ সালের জুলাই এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে মিয়ানমারের সঙ্গে তিন দফা বৈঠক করে বাংলাদেশ। ২০০৯ সালের মার্চ এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের সঙ্গেও সমুদ্রসীমা নিয়ে বৈঠক হয় (হাসান ২০১৪)। বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের অনন্য ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমলে নিয়ে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দাবী জানায়। অন্যদিকে মিয়ানমার ও ভারত সমদূরত্বের ভিত্তিতে সীমা নির্ধারণের পক্ষে মত দেয়। জাতিসংঘ সমুদ্র আইন (আনক্লজ) ১৯৮২ অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর মিয়ানমার ও ভারতের বিরুদ্ধে সালিসি নোটিশ পাঠায় (Hossain 1981)। পাশাপাশি দেশগুলোর সাথে আলোচনার দরজাও খোলা রাখে। মিয়ানমার ও ভারত ওই নোটিশে ইতিবাচক সাড়া দেয়। চিত্র ২-এ সমুদ্রসীমা মামলার দায়ের করার পূর্বে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র (ভারত এবং মায়ানমার) কর্তৃক সম-দূরত্ব

[১] 'The Blue Economy: Design Theory', available at http://www.theblueecnomy.org, accessed on 10 September 2014.

পদ্ধতিতে বাংলাদেশের নিষ্কন্টক সমুদ্রসীমা দাবীর অংশের পাশাপাশি ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের দাবীও বর্গাকার অংশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

চিত্র ২: ভারত এবং মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বিরোধপূর্ণ সমুদ্র সীমানার চিত্র

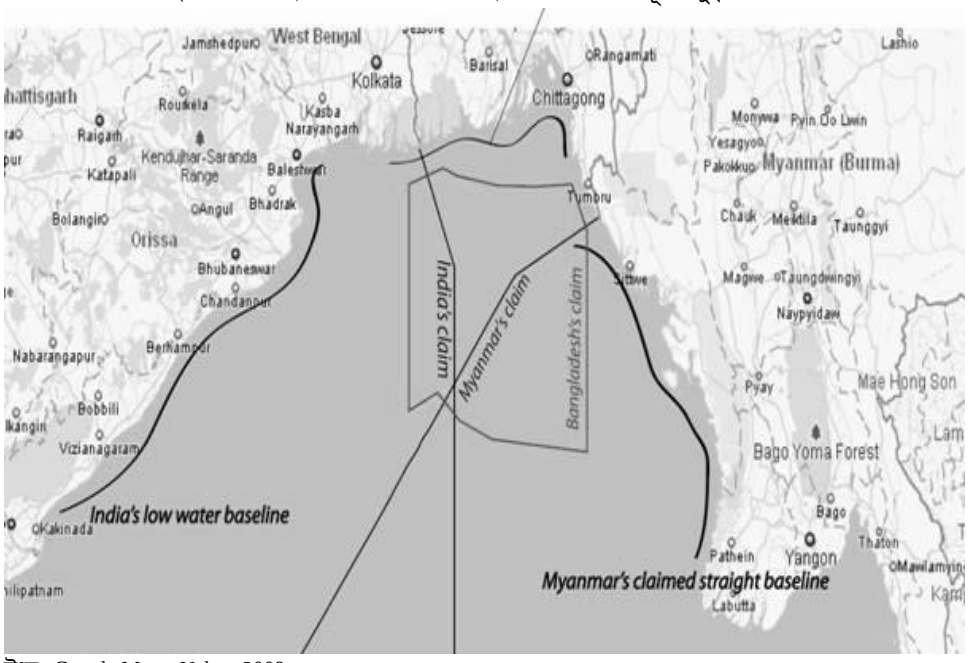

উৎস: Google Maps, Nahar, 2009।

৩.১। ভারতের সাথে বিরোধের কারণ

দু'দেশের সমুদ্রসীমার বিষয়ে ভারতের যুক্তি হলো সমদূরত্বের (ইকুইডিসট্যান্স) ভিত্তিতে রেখা টানতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ ইক্যুইটি বা ন্যায্যতার ভিত্তিতে রেখা টানার পক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় রেখা অবতল আকৃতির হওয়ায় বাংলাদেশ ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নির্ধারণে যুক্তি উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের যুক্তি অনুযায়ী ভূমির মূল বিন্দু থেকে সমুদ্রের দিকে ১৮০ ডিগ্রির সোজা রেখা যাবে। তবে ভারতের যুক্তি সমুদ্রতট বিবেচনায় এ রেখা হবে ১৬২ ডিগ্রি (মেহেদী ২০১৪)। ডিসেম্বর মৌখিক শুনানির আগে দু'দেশই নিজ নিজ পক্ষে লিখিত যুক্তি ও তথ্য-উপাত্ত আদালতে উপস্থাপন করে। মিয়ানমারের তুলনায় ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের ক্ষেত্রটা ছিল বেশি জটিল। ভারতের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় যুক্ত ছিল প্রথমটি ছিল দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউ মুর দ্বীপের মালিকানা নির্ধারণ, দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ১২ নটিক্যাল মাইলের যে আঞ্চলিক সমুদ্রসীমানা সেটি নির্ধারণ এবং তৃতীয়টি হলো আঞ্চলিক ১২ নটিক্যাল মাইল পানিসীমাসহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জোন নির্ধারণ (Jones 2009)।

৩.১.১। অস্তিত্বহীন দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ

আশির দশকে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে মতভেদ হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে। উভয় দেশ এই দ্বীপকে নিজের বলে দাবি করে। ওই এলাকার বাংলাদেশ-ভারতের সীমানা বিভাজক হাড়িয়াভাংগা নদীর মূলস্রোত যেহেতু দ্বীপের পশ্চিম ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, সেহেতু 'নদীর মূল স্রোতধারার মধ্যরেখা নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশ ওই দ্বীপটিকে নিজ দেশের অন্তর্ভুক্ত করছিল। অন্যদিকে ভারতের দাবী ছিল, নদীর মূলস্রোত পরিবর্তনশীল। তবে বর্তমানে ওই দ্বীপটির অস্তিত্ব নেই। দ্বীপের অস্তিত্ব না থাকায় এখন আর তা আদালতের রায় পাওয়া না পাওয়ার বিষয় নেই। তবে দ্বীপটির অস্তিত্ব থাকলে তা দুই দেশের সীমা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

৩.২। মায়ানমারের সাথে বিরোধের কারণ

০১ নভেম্বর ২০০৮ সালে মায়ানমার ডে'ইউ (কোরিয়া) কোম্পানির ৪টি ড্রিলিং জাহাজ নিয়ে তাদের নৌবাহিনীর ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানায় গ্যাস/তেল অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ করে (Firoze 2014)। বাংলাদেশ সাথে সাথে তার সার্বভৌম সমুদ্রসীমায় (বাংলাদেশের বিবেচনায়) মায়ানমারের এই অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা জানায় এবং কুটনৈতিকভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করে। দুই দিন পর বাংলাদেশের কুটনৈতিক চাপের মুখে মায়ানমার তার ড্রিলিং জাহাজগুলো সরিয়ে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও মায়ানমার প্রথম থেকেই এর মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছিল (Rangreji 2012), যা হ্যামবুর্গ এজলাসে সমুদ্রসীমা বিভাজনের সময় মায়ানমার কর্তৃক উত্থাপিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ তার অবিচ্ছেদ্য সমুদ্রসীমায় যে তেল/গ্যাস এর ব্লকগুলো ইজারা দিতে চেয়েছিল মায়ানমারের বাধার কারণে তাও সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না। মিয়ানমার ও ভারত সমদূরত্বের ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা দাবী করায় বাংলাদেশের সাগর এলাকা সীমিত হয়ে পড়েছিল মাত্র ১৩০ নটিক্যাল মাইলে।

৩.৩। ভারতের সাথে আপত্তির নিষ্পত্তি

নেদারল্যান্ডসের রাজধানী হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালতে ২০১৩ সালের ০৯ থেকে ১৮ ডিসেম্বর সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পক্ষে বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। শুনানি শেষে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়, কার্যবিধির ১৫ ধারা অনুযায়ী ছয় মাস পর এই দুই নিকট প্রতিবেশীর সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায় দেয়া হবে। দুই দেশের জলসীমা শুরু হবে কোথা থেকে, সেটাই ছিল ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধের মূল বিষয়। এছাড়া ভূমিরেখার মূল বিন্দু থেকে সমুদ্রে রেখা টানার পদ্ধতি নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

সালিশি আদালত দু'দেশের উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক এবং মেমোরিয়াল ও কাউন্টার মেমোরিয়াল বিবেচনা করে ২০১৪ সালের ৭ জুলাই রায় প্রকাশ করেন। ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায়ে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। রায়ে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাই পেয়েছে বাংলাদেশ। বিরোধপূর্ণ এলাকায় ভারত পেয়েছে ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ এলাকার প্রায় ৭৬ শতাংশই পেয়েছে বাংলাদেশ (দেখুন চিত্র ৩)।

রায় অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারণে মূল ভূমিবিন্দু থেকে সমুদ্রের দিকে ১৭৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি রেখা টানা হয়েছে। বাংলাদেশের দাবী ছিল ১৮০ ডিগ্রি এবং ভারতের দাবী ছিল ১৬২ ডিগ্রি বরাবর রেখা (আতিক ২০১৪)। গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ভারতের সঙ্গে যে ১০টি ব্লক নিয়ে বিরোধ ছিল, তার প্রতিটিই বাংলাদেশের বলে ঘোষণা করা হয়।[২] এ রায়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ২০০ নটিক্যালের বাইরে মহিসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম অধিকার সুনিশ্চিত হয়। এর বাইরে ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের অধিকারীও হয় বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক স্থায়ী সালিশি আদালতের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯৪৭ সালে রেডক্লিফের সীমানা নির্ধারণ মানচিত্রকে ভিত্তি ধরে এ রায় দেওয়া হয়েছে (Khan 2014)। রায়ের মধ্য দিয়ে এ বিপুল অঞ্চলে বাংলাদেশের পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৩: স্থায়ী সালিশি আদালত কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদানকৃত নতুন সমুদ্র সীমানা

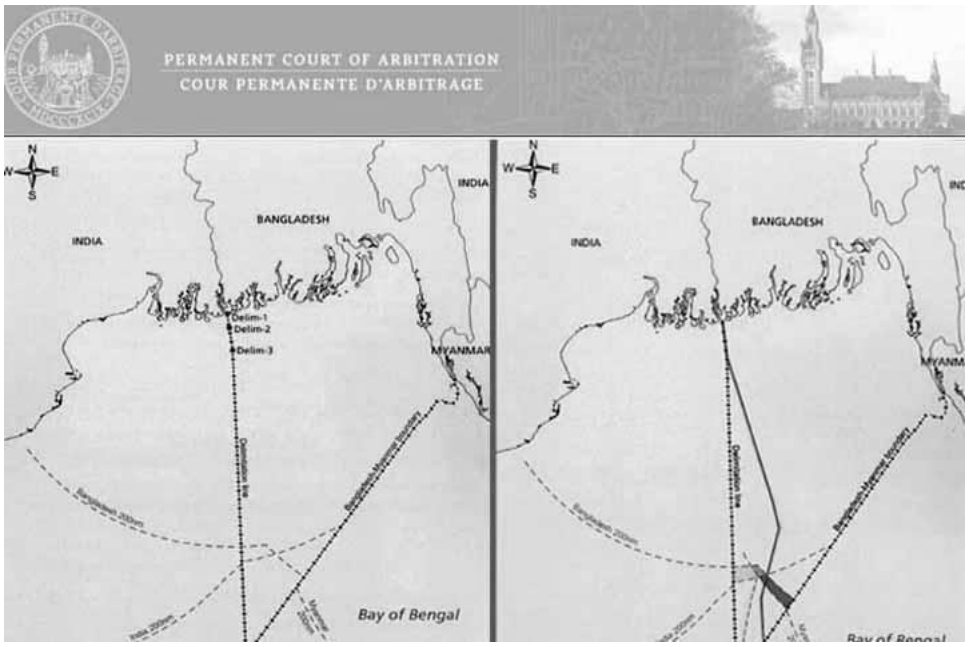

উৎস: ETOPO2, 2014 থেকে ভিত্তি মানচিত্রটি নেয়া হয়েছে।

৩.৪। মায়ানমারের সাথে আপত্তির নিষ্পত্তি

২০১২ সালের ১৪ মার্চ ইটলস বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানা চিহ্নিত করে রায় দেয়। এতে বঙ্গোপসাগরে ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটারের ওপর বাংলাদেশ অধিকার লাভ করে। রায়ে বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন দ্বীপ এর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। তাছাড়া

[২] দেখুন ''A Historic Win for Bangladesh,'' *The Daily Sun*,9 July 2014।

গভীর ও অগভীর সমুদ্রের দাবীকৃত ২০টি ব্লকের মধ্যে বাংলাদেশ ১২টির কর্তৃত্ব লাভ করে (আহমেদ ২০১২)। কোর্ট ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সমুদ্রসীমা বিভাজন করেন। এতে করে বঙ্গোপসাগরে বৃহৎ অংশে তেল/গ্যাস উত্তোলনে বাংলাদেশের কোনো বাধা রইল না। সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরে ৬৮৫ বর্গকিলোমিটার একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এর বাহিরে মহিসোপানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্জন ব্যাপক সম্ভাবনাময়।[৩] এই সীমানা নির্ধারণের ফলে এখন বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে কোনো দেশের বাধা ব্যতিরেকেই গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ ও তলদেশের খনিজ সম্পদ আহরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে।

৪। বাংলাদেশ সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাসসহ নানা সম্পদ লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশ চাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের খনিজ পদার্থ ও হাইড্রোকার্বনের উপর তার অধিকার। এই রায়ের ফলে গভীর সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ আহরণ, সমুদ্রের তলদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সমুদ্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈশ্বিক জিডিপিতে ৯ শতাংশ অবদান রাখছে পর্যটন খাত (MoFA 2014)। এছাড়া জ্বালানি খাতও রাখছে ব্যাপক অবদান। এসব কারণে নীল সমুদ্র অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে সরকার। এই আইনি বিজয় গ্যাসক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা বাংলাদেশে খুব কম পরিমাণ গ্যাস মজুদ রয়েছে যা গ্যাস আগামী ১২-১৩ বছর পর্যন্ত চলতে পারে (Akram 2014)। অর্জিত সমুদ্রসীমায় আরও গ্যাস পাওয়া যাবে এবং তা উত্তোলনের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

মাছ আহরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণ আমাদের কাছে নেই। খনিজ সম্পদ উত্তোলনের মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও নেই। তাই সমুদ্রের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দক্ষ জনবল তৈরি ও উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ একান্ত আবশ্যক (রহমান ও ইসলাম ২০১৪)। দেশের সমুদ্রসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে নীল সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি গড়ে তোলা আবশ্যক।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক মাছ আহরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত (নিশাত ২০১৪)। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে বসবাসকারী। শুধু উন্নয়নশীল দেশেই ২৫ বিলিয়ন ডলার মাছ কেনাবেচা হয়। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য বড় অংশ এখন বাংলাদেশ পাচ্ছে। এ কারণে মাছ ধরার জন্য আরও উন্নত নৌযান, প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করতে হবে। এখন মাছ ধরার জন্য প্রায় ৫০ হাজার কাঠের নৌকা চলাচল করে। এগুলোর পরিবর্তে মাছ ধরার জন্য ফিশিং ট্রলার বাড়াতে হবে। এর ফলে সমুদ্র থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণ বাড়বে। কাঠের নৌকা উপকূল থেকে খুব বেশি দূরে যেতে পারে না। মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৭৩ হাজার মেট্রিক টন মাছ সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়েছে (হোসেন ২০১৪)। এর আগে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মাত্র ৫ শতাংশ এলাকায় মাছ ধরার ট্রলারগুলো যেতে পারত। ভারতের সঙ্গে বিরোধ অবসানের কারণে বাকি ৯৫ শতাংশ

[৩] Available at http://sasba.net/news/burma-bangladesh-maritime-dispute-ends accessed on 10 June 2014.

এলাকায়ও মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মৎস্য সম্পদ আহরণের পরিমাণ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে চার থেকে পাঁচ গুণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

মৎস্য সম্পদ ছাড়াও এ অঞ্চলে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল বাড়ানো যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাণিজ্যিক ভাবে প্রায় আড়াই হাজার জাহাজ চলাচল করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব জাহাজ মাত্র ৭০টি। জাহাজ ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে বছরে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয় (মেহেদী ও বাসার ২০১৪)। এখন পণ্য পরিবহনে আমাদের নিজস্ব জাহাজ বাড়ানো যেতে পারে এবং বিনিয়োগের একটা বড় খাতও এটা হতে পারে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রক্রিয়াও দ্রুত এগিয়ে নেওয়া যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে এই সম্পদ আহরণের জন্য প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল তৈরি। দেশের ২২টি মেরিন একাডেমি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে দক্ষ জনবল খুব কম সময়ে পাওয়া যাবে বলে অনুমেয়।

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যায়, মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের কারণে এতদিন সাগর ও স্থলভাগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ কম ছিল (Fatima 2014)। পেট্রোবাংলার দরপত্র আহ্বান করাও সমস্যা সংকুল ছিল। আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের রায়ের পর অতীতের বিরোধপূর্ণ ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের আর কোনো বাধা নেই। কেননা ওই সব ব্লক বাংলাদেশের অংশে পড়েছে। এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলোর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের কয়েকটি কোম্পানি এরই মধ্যে দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছে। রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ বিশাল জলরাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করবে।

৫। সমুদ্র সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ এবং করণীয়

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিদ্যমান সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করছিল। সমুদ্রসীমা বিরোধের আইনগত ও শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের সাথে সমুদ্র বিষয়ে সমঝোতা ও সহযোগিতার নতুন দুয়ার খুলে দেবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সদ্যপ্রাপ্ত এই রায় থেকে বাংলাদেশ কি কি ফায়দা নিতে পারে।

৫.১। জরিপ পরিচালনা করা

বাংলাদেশের স্থল, জল ও আকাশসীমার যাবতীয় রেকর্ডপত্র তৈরি করা, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে বিতরণের কার্যভার বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের। আদালতের রায়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি হওয়া সমুদ্রাঞ্চলের সীমানা চিহ্নিতকরণ জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করে তা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে বিতরণকল্পে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট একাডেমিক-গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

৫.২। সমুদ্রবিষয়ক কমিশন বা অধিদপ্তর গঠন করা

বাংলাদেশের স্থলসীমার প্রায় সম-আয়তনবিশিষ্ট সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ে একান্ত নজর দেওয়ার জন্য সমুদ্রবিষয়ক স্বতন্ত্র কমিশন বা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আলাদা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে

সমুদ্রবিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, আন্ত:মন্ত্রণালয়ে সমন্বয়সহ নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য। কেননা সমুদ্রাঞ্চলের নিরাপত্তা, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন।

৫.৩। মৎস্য সম্পদ আহরণ

বাংলাদেশের রূপালি মাছের খনিখ্যাত বঙ্গোপসাগর প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ৩০১ প্রজাতির ওয়েষ্টার-শামুক-ঝিনুক, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবালসহ নানা আহরণযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে ভরপুর।[৪] ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমুদ্রাঞ্চল থেকে পাঁচ লাখ ৮৮ হাজার ৯৮৮ টন সামুদ্রিক মাছ আহরণ করা, যা দেশের মোট মৎস্য আহরণের ১৭ শতাংশ। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল তিন লাখ ৫১ হাজার ২২৩ টন, যার ৭২ শতাংশ সমুদ্রাঞ্চল থেকে আহরিত। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় চার হাজার ৩১৩ কোট টাকার ৮৪ হাজার ৯০৫ টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ২.০১ শতাংশ (রহমান ও ইসলাম ২০১৪)। মৎস্য সম্পদ যাতে অতি আহরিত না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে, অর্থাৎ টেকসই করতে হবে।

এ ছাড়া সমুদ্রসীমায় জাহাজে ব্যবহৃত তেল ফেলে দূষণকারী জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া এলাকার মৎস্য সম্পদ আহরণ আপামর জনসাধারণের খাদ্য ঘাটতি পূরণ, পুষ্টির চাহিদা মেটানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক খাত সমৃদ্ধ করবে। এ ক্ষেত্রে সমুদ্র সীমান্তবর্তী এলাকার মৎস্য আহরণকারীদের ব্যবহারপযোগী ভাসমান বয়া বা প্লাটফর্ম স্থাপন করা যেতে পারে। এতে আহরিত মৎস্যের যথাযথ ব্যবহার ও সর্বোচ্চ গুণগত মান রক্ষায় সাময়িক প্রক্রিয়াজাত ও গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে ফিডার ভেসেলের মাধ্যমে উপকূলে স্থানান্তর করা যেতে পারে।[৫] তাছাড়া সোনাদিয়া এবং পটুয়াখালীর পায়রাতে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

৫.৪। তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান

বাংলাদেশের অগভীর ও গভীর সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস মজুদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। উপকূলবর্তী সাঙ্গু অববাহিকা থেকে গ্যাস উত্তোলন ও তা জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতায় সমুদ্রের তলদেশের সম্পদের শনাক্তকরণ ও পরিমাণ নির্ণয় করার ব্যাপারে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বঙ্গোপসাগরে খনিজ তেল ও গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে, যা আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। কাজেই এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন ও

---

[৪] "No Preparations to Exploit Huge Opportunity", *The Daily Sun,* p.1, 9 July 2014।

[৫] সেলিনা আফরোজা, পিএইচডি, সচিব, মৎস্য ও প্রাণীজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং লেখকের সাক্ষাৎকার, ১৭ নভেম্বর ২০১৪।

অনুসন্ধানের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পেট্রোবাংলাকে শক্তিশালী করা দরকার। সমুদ্রে জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিউটাইলসহ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে (Devare 2006)। কিন্তু এসব উত্তোলনের কোনো যন্ত্রপাতি আমাদের নেই। তাই এ ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।

সমুদ্রে আরও আছে কাঁকড়া, কচ্ছপ, কুমির, হাঙ্গর, সি-আরসিন, সি-কিউকাম্বার, জেলি ফিশ, শামুক, ঝিনুক এবং নানা পুষ্টিগুণসম্পন্ন আগাছা। বিদেশে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এগুলোর ব্যবহার হতে পারে মানুষের খাদ্য হিসেবে, কিংবা প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা যেতে পারে নানা ধরনের ঔষুধ। সামুদ্রিক কচ্ছপ উচ্চ প্রোটিন সম্পন্ন। এ ছাড়া তেল ও ঔষুধের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা হয় কচ্ছপ, কুমির ও হাঙর।[৬] কিন্তু এগুলো আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ খুবই সীমিত। এসব মূল্যবান সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে লবণ উৎপাদন শিল্প। সমুদ্রের লোনা পানিকে আটকিয়ে সূর্যের তাপ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ টনেরও বেশি উৎপাদিত লবণ দেশের লবণের চাহিদা পূরণ করছে। বর্তমানে দেশে ২৯০ টিরও বেশি রিফাইনিং ইউনিট আছে, কিন্তু লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচুর লবণ বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

৫.৫। সমুদ্র যোগাযোগ পথের সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা

বাংলাদেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় জলাঞ্চলের সার্বিক তদারকি, নিরাপত্তা, সম্পদ আহরণসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডও দায়িত্ব পালন করছে। কাজেই আদালতের রায়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা এই বিশাল সমুদ্রাঞ্চলের সার্বক্ষণিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহর বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় জাহাজ ও লোকবল সংযোজন করে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন (Samudrogupto 2011)। অন্য কোনো দেশের ট্রলার এসে যেন আমাদের মৎস্য সম্পদ লুট করে না নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কোস্টগার্ডের কর্মপরিধিও বৃদ্ধি করা জরুরি। তবে এজন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, অস্ত্রবল, রণবহর যোগান দিতে হবে।

৫.৬। সমুদ্র পরিবহন ও সমুদ্র-যোগাযোগ পথ

বাংলাদেশের প্রায় ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যিক পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২,৬০০ বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে উঠানো ও নামানো হয় (Alam)। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী জাহাজ সমুদ্র পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দেশে গড়ে উঠেছে শিপিং এজেন্সী, ফ্রেইট-ফরোয়ার্ডিং, ব্যাংকিং এবং বীমা। যার ফলে লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। সমুদ্র পরিবহন ও সমুদ্র যোগাযোগ পথের আরও উন্নয়ন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। ঢাকার অদূরে নদীপথে

[৬] আবুবকর সিদ্দিক, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং লেখকের সাক্ষাৎকার, ১৭ নভেম্বর ২০১৪।

কন্টেইনার পরিবহনের লক্ষ্যে নির্মিত প্রথম কন্টেইনার টার্মিনালটি চালু হলে কন্টেইনার পরিবহনের খরচ প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পাবে। দেশের প্রধান মহাসড়কগুলোর উপর হতে চাপও কমে যাবে।

৫.৭। পর্যটনের প্রসার

সামুদ্রিক পর্যটন প্রসারেও সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। বর্ষায় সমুদ্র উত্তাল থাকে। কিন্তু শীতে শান্ত উপকূলীয় এলাকায় ইকোট্যুরিজমের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক ডলফিন এবং ভেসে ওঠা তিমি অথবা হাঙ্গরের বিচরণ দেখতে বহু পর্যটক আগ্রহী হবেন। এ ছাড়া সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি জাহাজের নিরাপদ চলাচলের সুযোগও তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার ইত্যাদি রাষ্ট্র নিয়ে একটি আঞ্চলিক পর্যটন অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে (Askari 2014)। এছাড়া সামুদ্রীক মৎস্য সম্পদ প্রদর্শনের নিমিত্তে কক্সবাজারে একটি সামুদ্রীক মৎস্য সম্পদ যাদুঘরসহ 'পর্যটন উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র' গঠন করা যেতে পারে। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যা ঐ সমস্ত এলাকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৫.৮। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙা শিল্প

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করছে। জাহাজ তৈরি Tonnage বিবেচনায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩ তম। খুলনা শিপইয়ার্ডে দেশি জাহাজ মেরামত করা ছাড়াও প্রথম বারের মতো সমুদ্র এলাকায় টহলের জন্য একটি যুদ্ধাজাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাহাজ ভাঙা শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয়। পৃথিবীর মোট জাহাজ ভাঙার ২৪.৮ শতাংশ সম্পাদিত হয় চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে। এই শিল্পের মানোন্নয়ন করে বাংলাদেশের অর্থনীতির অধিকতর উন্নয়ন সম্ভব। তবে এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার।

৫.৯। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা

জাতীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া সমুদ্রসম্পদের আহরণ ও সদ্ব্যবহার সম্ভব নয়। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি অপরিহার্য। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ শনাক্তকরণ, প্রাচুর্যতা নিরূপণ, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণসহ সামুদ্রিক পরিবেশদূষণ ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও চিংড়ির পোনা উৎপাদনে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে আসছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রতি বছরই গ্র্যাজুয়েটেরা বের হচ্ছে।। এসব গ্র্যাজুয়েটদের কাজে লাগিয়ে সমুদ্র সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব। তবে অধিক হারে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত গবেষণা বরাদ্দ প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাচীনতম সমুদ্রবিজ্ঞান শিক্ষাবিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজের আধুনিকায়ন অতীব প্রয়োজন।

৬। উপসংহার

২০১২ সালের ৭ জুলাই এবং ২০১৪ সালের ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমায় নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই শেষ কথা নয়। সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় বাংলাদেশকে সামুদ্রিক মানচিত্র প্রণয়নের পাশাপাশি সমুদ্র জরিপ, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণ, পর্যটন এবং নৌ চলাচল ও সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এই কাজের জন্য বাংলাদেশের দরকার দক্ষ জনশক্তি ও কারিগরি জ্ঞান। মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশকে এখনই নজর দিতে হবে এবং উন্নত দেশসমূহ হতে সহযোগিতার মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে অগ্রাধিকার দিয়ে 'ব্লু ইকোনমি' বা নীল সমুদ্র অর্থনীতিকে পরিপূরক মডেল হিসেবে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ দেশে দীর্ঘময়াদি প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। ফলে বাংলাদেশ অল্প দিনের মধ্যেই অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে পারে।

শুধু স্থলভাগ নয়, এর সাথে সমুদ্র সম্পদের অধিকতর ব্যবহারই কোনো দেশের একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন ইতিহাসের মাইল ফলক। সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের সদ্ব্যবহার বাংলাদেশের উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সমুদ্রকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে শুধুমাত্র অধিকতর কর্মসস্থানই সৃষ্টি হবে না বরং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বাংলাদেশ সক্ষম হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ধারণার সম্পূরক হিসেবে 'সমুদ্রমাতৃক' বাংলাদেশের কথা আমাদেরকে বেশি করে ভাবতে হবে এবং যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার অবদান নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা সমুদ্র বিজয়ের প্রকৃত সুফল থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

আতিক, আহমদ (২০১৪): "রায় বাংলাদেশের পক্ষে," *দৈনিক ইনকিলাব*, ০৮ জুলাই *ঢাকা*।

আহমেদ, শামিম (২০১২): "সমুদ্র বিজয়," *সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার*, খন্ড ২৮, সংখ্যা ৩৬, পৃ ১২-১৩, ২৩ মার্চ।

নাথ, ধীরাজ কুমার (২০১৪): "নীল অর্থনীতি খুলে দেবে সম্পদের সিংহ দুয়ার," দৈনিক যুগান্তর, ০২ সেপ্টেম্বর।

নিশাত, আইনুন (২০১৪): "সমুদ্রসীমা মীমাংসা এখন প্রয়োজন সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার," *দৈনিক সমকাল*, *ঢাকা*, ০৯ জুলাই।

মেহেদী, রাশেদ (২০১৪): "সমুদ্রজয়ের নতুন ইতিহাস," *দৈনিক সমকাল*, ০৯ জুলাই, *ঢাকা*।

মেহেদী, রাশেদ ও রফিকুল বাসার (২০১৪): "সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করবে পেট্রোবাংলা," *দৈনিক সমকাল*, *ঢাকা*, ১০ জুলাই।

রহমান, আরিফুর ও রফিকুল ইসলাম (২০১৪): "অপার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর প্রস্তুতি নেই," *দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, *ঢাকা*, ০৯ জুলাই।

রশিদ, হারুন অর (২০০৮): "সমুদ্র সীমা নির্ণয়ের আইন," *ঢাকা কুরিয়ার*, সাপ্তাহিক, খন্ড-২৪, সংখ্যা-৩৯, ১৮ এপ্রিল পৃ ১৮-১৯।

হাসান, মেহেদী (২০১৪): "ন্যায্যতা ও বন্ধুত্বের জয়," দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ০৮ জুলাই।

হোসেন, মো: শাহাদাত (২০১৪): "সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মহাপরিকল্পনা দরকার," দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ঢাকা, ১৪ জুলাই।

Akram, Saleh (2014): "Survey of Marine Resources Brooks No Delay," *The Financial Express*, 20 July.

Alam, Khurshed (n.d.) "Delimitation of Maritime Boundary: Challenges and Prospects for Future Bangladesh," Concept Paper.

Askari, Rashid (2014): "Conquests of The Bay: The Herald of a New Maritime Era," *Dhaka Courier*, Vol.31,No.1,18 July, pp.14-17.

Bhuiyan, Kamal Uddin and Md Jahangir Alam (2014): "Integrated Maritime Policy to Boost Blue Economy," *The Daily Star*,19 October.

Chowdhury, Shabbir Ahmed (2008): "Delimination of Maritime Boundaries of Bangladesh: Problems and Prospects," *NDC Journal*, Vol.7,No.1, pp. 185-201.

Datta, Bishwajit (2014): "Equity Over Equidistance: A New Hope", The New Age, 21 July.

Devare, S. (2008): "A New Energy Frontier: The Bay of Bengal Region*," Institute of Southeast Asian Studies*, Vol. xix, p.205.

Fatima, Kaniz (2014): "Untapped Seabed Resources," *The Independent*, 20 July.

Firoze, Adnan (2012): "Bangladesh-Myanmar Maritime Dispute: What Actually Happened?" Dhaka Courier, *Bangladesh*.

Jones, R. (2009): "Sovereignty and Statelessness in the Border Enclaves of India and Bangladesh," *Political Geography*, Vol. 28, No.6, pp. 373-381.

Hossain, "Bangladesh-India Relations: Issues and ProblemsÓ, *Asian Survey*, Vol. XXI, p.274.

Houghton, K. J. (2010): "Maritime Youndaries in a Rising Sea," *Nature Geosciences*, Vol.3, No.12, pp. 813-816.

Khan, Sharier (2014): "Verdict Brings New Hope*," The Daily Star*, p. 19, July.

MoFA (2014): "Concept Paper on Ocean/Blue Economy-Modern Economic Vision," paper Presented by Ministry of Foreign Affairs at on International Seminar on Ocean /*Blue Economy*, Dhaka, February.

Rangreji, Luther (2012): "Bangladesh-Myanmar Maritime Boundary Delimitation Dispute," *Journal of International Affairs*,Vol. 16, Nos. 1 & 2, pp.33-58.

Samudrogupto, Nirvik (2011): "Maritime Security for Energy Security," *Bangladesh Defense Journal*, Vol.1,No.43, October, pp.33-35.

Spalding, M. D. *et al*. (2007): "Marine Ecoregions of the World: A Bio Region Alization of Coastal and Shelf Areas," *Bioscience*, 57(7): 573-583.

United Nations (1987): "Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea*" Maritime Boundary Agreements* (1970-1984), New York, Vol. XVIII, p. 297.